কুরআন অধ্যয়ন প্রতিযোগিতা ২০২৪
প্রস্তুতি সহায়ক তাফসীর নোট পর্বঃ ২০

সূরা কিয়ামাহ

সূরা আল-ক্বিয়ামাহ কুরআনের ৭৫ তম সূরা; এর আয়াত সংখ্যা ৪০ এবং রূকু সংখ্যা ২। সূরা আল-ক্বিয়ামাহ মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

নামকরণ

সূরার প্রথম আয়াতের الْقِيٰمَةِ আলকিয়ামহ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এটি শুধু সূরাটির নামই নয়, বরং বিষয়ভিত্তিক শিরোনামও। কারণ এ সূরায় শুধু কিয়ামত সম্পর্কে আলোচন করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

কোন হাদীস থেকে যদিও এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল জানা যায় না। কিন্তু এর বিষয়বস্তুর মধ্যেই এমন একটি প্রমাণ বিদ্যমান যা থেকে বুঝা যায়, এটি নবুয়াতের একেবারে প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরাসমূহের অন্যতম। সূরার ১৫ আয়াতের পর হঠাৎ ধারাবাহিকতা ক্ষুন্ন করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হচ্ছে: এ অহীকে দ্রুত মুখস্ত করার জন্য তুমি জিহবা নাড়বে না। এ বাণীকে স্মরণ করিয়ে দেয়া এবং পড়িয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। অতএব আমি যখন তা পড়ি তখন তুমি তা মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকো। এর অর্থ বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব। এরপর ২০ নম্বর আয়াত থেকে আবার সে পূর্বের বিষয়ে আলোচনা শুরু হচ্ছে যা প্রথম থেকে ১৫ নম্বর আয়াত পর্যন্ত চলছিল। সে সময় হযরত জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এ সূরাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শুনাচ্ছিলেন পরে ভুলে যেতে পারেন এ আশংকায় তিনি এর কথাগুলো বার বার মুখে আওড়াচ্ছিলেন। এ কারণে পূর্বাপর সম্পর্কহীন এ বাক্যটি পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং হাদীসের বর্ণনা উভয় দিক থেকেই বক্তব্যের মাঝখানে সন্নিবেশিত হওয়া যথার্থ হয়েছে। এ থেকে জানা যায় যে, এ ঘটনা সে সময়ের যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবে মাত্র অহী নাযিলের নতুন নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করছেন এবং অহী গ্রহণের পাকাপোক্ত অভ্যাস তাঁর তখনো ও গড়ে ওঠেনি। কুরআন মজীদে এর আরো দু'টি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একটি সূরা ত্বা-হা যেখানে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাল্লাহকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে:لَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ "আর দেখো, কুরআন পড়তে তাড়াহুড়া করো না, যতক্ষণ না তোমাকে অহী পূর্ণরূপে পৌঁছিয়ে দেয়া হয়। (আয়াত ১১৪)। দ্বিতীয়টি সূরা আলায়। এখানে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলা হয়েছে: سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى "আমি অচিরেই তোমাকে পড়িয়ে দেব তারপর তুমি আর ভুলে যাবে না।" (আয়াত ৬) পরবর্তী সময়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহী গ্রহনে ভালভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেলে এ ধরনের নির্দেশনা দেয়ার আর প্রয়োজন থাকেনি। তাই কুরআনের এ তিনটি স্থান ছাড়া এর আর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরা থেকে কুরআন মজীদের শেষ পর্যন্ত যতগুলো সূরা আছে তার অধিকাংশের বিষয়বস্তু ও বর্ণনাভঙ্গী থেকে বুঝা যায় যে, সূরা মুদ্দাস্সিরের প্রথম সাতটি আয়াত নাযিল হওয়ার পর যখন অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টি বর্ষণের মত কুরআন নাযিলের সিলসিলা শুরু হলো, এ সূরাটিও তখনকার অবতীর্ণ বলে মনে হয়। পর পর নাযিল হওয়া এসব সূরায় জোরালো এবং মর্মস্পর্শী ভাষায় অত্যন্ত ব্যাপক কিন্তু সংক্ষিপ্ত বাক্যে ইসলাম এবং তার মৌলিক আকীদা-বিশ্বাস ও নৈতিক শিক্ষাসমূহ পেশ করা হয়েছে এবং মক্কাবাসীদেরকে তাদের গোমরাহী সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। এ কারণে কুরাইশ নেতারা অস্থির হয়ে যায় এবং প্রথম হজ্বের মওসুম আসার আগেই তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরাভুত বা ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য নানা রকম ফন্দি-ফিকির ও কৌশল উদ্ভাবনের জন্য একটি সম্মেলনের আয়োজন করে। সূরা মুদ্দাস্সিরের ভূমিকায় আমরা এ বিষয়ের উল্লেখ করেছি।

এ সূরায় আখেরাত অবিশ্বাসীদের সম্বোধন করে তাদের এককেটি সন্দেহ ও একেকটি আপত্তি ও অভিযোগের জওয়াব দেয়া হয়েছে। অত্যন্ত মজবুত প্রমাণাদি পেশ করে কিয়ামত ও আখেরাতের সম্ভাব্যতা, সংঘটন ও অনিবার্যতা প্রমাণ করা হয়েছে। আর একথাও স্পষ্ট করে বলে দেয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তিই আখেরাতকে অস্বীকার করে, তার অস্বীকৃতির মূল কারণ এটা নয় যে, তার জ্ঞানবুদ্ধি তা অসম্ভব বলে মনে করে। বরং তার মূল কারণ ও উৎস হলো, তার প্রবৃত্তি তা মেনে নিতে চায় না। সাথে সাথে মানুষকে এ বলে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, যে সময়টির আগমনকে তোমরা অস্বীকার করছো তা অবশ্যই আসবে। তোমাদের সমস্ত কৃতকর্ম তোমাদের সামনে পেশ করা হবে। প্রকৃতপক্ষে আমলনামা দেখার পূর্বেই তোমাদের প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেই জানতে পারবে যে, সে পৃথিবীতে কি কি কাজ করে এসেছে। কেননা কোন মানুষই নিজের ব্যাপারে অজ্ঞ বা অনবহিত নয়। দুনিয়াকে প্রতারিত করার জন্য এবং নিজের বিবেককে ভুলানোর জন্য নিজের কাজকর্মও আচরণের পক্ষে যত যুক্তি, বাহানা ও ওযর সে পেশ করুক না কেন।

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ

১. আমি শপথ করছি কিয়ামতের দিনের

কারও বিরোধী মনোভাব খন্ডন করার জন্যে শপথ করা হলে শপথের পূর্বে ﻻ ব্যবহৃত হয়। আরবী বাক-পদ্ধতিতে এই ব্যবহার প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। এ শব্দ দ্বারা বক্তব্য শুরু করাই প্রমাণ করে যে, আগে থেকে কোন বিষয়ে আলোচনা চলছিল যার প্রতিবাদ করার জন্য এ সূরা নাযিল হয়েছে। অর্থাৎ তোমরা যা বলছে তা ঠিক নয়। আমি কসম করে বলছি, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এটি। অর্থাৎ কেয়ামত অবশ্যম্ভাবী। রবর্তী বক্তব্য স্বতঃই স্পষ্ট করে দেয় যে, আলোচনার বিষয় ছিল কিয়ামত ও আখেরাতের জীবন। আর মক্কার লোকেরা এটি শুধু অস্বীকারই করে আসছিলো না বরং অস্বীকৃতির সাথে সাথে তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপও করে আসছিলো। একটি উদাহরণ দ্বারা এ বর্ণনাভঙ্গী ভাল করে বুঝা যেতে পারে। আপনি যদি শুধু রসূলের সত্যতা অস্বীকার করতে চান তাহলে বলবেনঃ আল্লাহর কসম রসূল সত্য। "কিন্তু কিছু লোক যদি রসূলকে অস্বীকার করতে থাকে তবে তার উত্তরে আপনি কথা বলতে শুরু করবেন এভাবেঃ না, আল্লাহর কসম, রসূল সত্য। এর অর্থ হবে, তোমরা যা বলছো তা ঠিক নয়। আমি কসম করে বলছি, প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে এটি।

وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

২. আমি আরও শপথ করছি ভর্ৎসনাকারী আত্মার।

لوامة শব্দটি لوم থেকে উদ্ভুত। অর্থ তিরস্কার ও ধিক্কার দেয়া। 'নাফসে লাওয়ামা' বলে এমন নফস বোঝানো হয়েছে, যে নিজের কাজকর্মের হিসাব নিয়ে নিজেকে ধিক্কার দেয়। অর্থাৎ কৃত গোনাহ অথবা ওয়াজিব কর্মে ত্রুটির কারণে নিজেকে ভর্ৎসনা করে বলে যে, তুই এমন করলি কেন? সৎকর্ম সম্পর্কেও নিজেকে এই বলে তিরস্কার করে যে, আরও বেশী সৎকাজ সম্পাদন করে উচ্চমর্যাদা লাভ করলে না কেন? সারকথা, কামেল মুমিন ব্যক্তি সর্বদাই তার প্রত্যেক সৎ ও অসৎ কাজের জন্যে নিজেকে তিরস্কারই করে। গোনাহ অথবা ওয়াজিব কর্মে ত্রুটির কারণে তিরস্কার করার হেতু স্পষ্ট। সৎকাজে তিরস্কার করার কারণ এই যে, নফস ইচ্ছা করলে আরও বেশী সৎকাজ করতে পারত। সে বেশী সৎকাজ করল না কেন?

এই অর্থের ভিত্তিতেই হাসান বাসরী রাহেমাহুল্লাহ নফসে-লাওয়ামার তফসীর করেছেন নফসে মুমিনাহ। তিনি বলেছেনঃ আল্লাহর কসম, মুমিন তো সর্বদা সর্বাবস্থায় নিজেকে ধিক্কারই দেয়। সৎকর্মসমুহেও সে আল্লাহর শানের মোকাবেলায় আপন কর্মে অভাব ও ত্রুটি অনুভব করে। [কুরতুবী] কেননা, আল্লাহর শানের হক পুরোপুরি আদায় করা সাধ্যাতীত ব্যাপার। ফলে তার দৃষ্টিতে ত্রুটি থাকে এবং তজ্জন্যে নিজেকে ধিক্কার দেয়। পক্ষান্তরে অসৎ কাজ হলে মুমিনের কাছে এটা অত্যন্ত কঠোর হয়ে দেখা দেয় ফলে সে নিজেকে ধিক্কার দেয়। [বাগভী]

মূলতঃ নফস তিনটি গুণে গুণান্বিত হয়। নফসে আম্মারা, লাওয়ামা ও মুতমায়িন্নাহ। সাধারণত নাফসে আম্মারা বা খারাপ কাজে উদগ্রীবকারী আত্মা প্রতিটি মানুষেরই মজ্জগত ও স্বভাবগত। সে মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত হতে জোরদার আদেশ করে। কিন্তু ঈমান, সৎকর্ম ও সাধনার বলে সে নফসে-লাওয়ামা হয়ে যায় এবং মন্দ কাজ ও ত্রুটির কারণে অনুতপ্ত হতে শুরু করে। এটাকেই অনেকে বিবেক বলে। কিন্তু মন্দ কাজ থেকে সে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয় না। অতঃপর সৎকর্মে উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্যলাভে চেষ্টা করতে করতে যখন শরীয়তের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন তার মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে যায় এবং শরীয়তবিরোধী কাজের প্রতি স্বভাবগত ঘৃণা অনুভব করতে থাকে, তখন এই নফসই মুতমায়িন্নাহ বা সন্তুষ্টচিত্ত উপাধি প্রাপ্ত হয়।

এ ধরনের নাফস যাদের অর্জিত হয় তারা দ্বীনী ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে মুক্ত হয়ে 'কালবে সালীম' বা সুস্থ হৃদয়ের অধিকারী হয়। আর এ সমস্ত লোকদের প্রশংসায় আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে বলেছেন, "যে দিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবে না; সে দিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর কাছে আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।" [সূরা আশ-শু'আরা: ৮৮–৮৯]

أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَلَّنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ

৩. মানুষ কি মনে করে যে, আমরা কখনোই তার অস্থিসমূহ একত্র করতে পারব না?

কসম আকারে ওপরে বর্ণিত দু'টি দলীল শুধু দু'টি বিষয় প্রমাণ করে। এক, এ দুনিয়ার পরিসমাপ্তি (অর্থাৎ কিয়ামদের প্রথম পর্যায়) একটি নিশ্চিত ও অনিবার্য ব্যাপার। দুই, মৃত্যুর পরে আরেকটি জীবন অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। কারণ তা ছাড়া মানুষের একটি নৈতিক সত্তা হওয়ার যৌক্তিক ও প্রকৃতিগত দাবী পুরণ হতে পারে না। আর এ ব্যাপারটি অবশ্যই সংঘটিত হবে। মানুষের মধ্যে বিবেক থাকাটাই তা প্রমাণ করে। মৃত্যুর পরের জীবন যে সম্ভব একথা প্রমাণ করার জন্যই এ তৃতীয় দলীলটি পেশ করা হয়েছে। মক্কার যেসব লোক মৃত্যুর পরের জীবনকে

অস্বীকার করতো তারা বার বার একথা বলতো যে, যেসব লোকেরা মৃত্যুর পর হাজার হাজার বছর অতিবাহিত হয়ে গেছে, যাদের দেহের প্রতিটি অণূ-পরমাণু মাটিতে মিশে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে, যাদের হাড়গোড় পচে গলে পৃথিবীর কত জায়গায় যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে তার কোন হদিস নেই, যাদের কেউ মরেছে আগুনে পুড়ে, কেউ হিংস্র জন্তুর আহারে পরিণত হয়েছে। আবার কেউ সমুদ্রে ডুবে মাছের খোরাক হয়েছে। তাদের সবার দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আবার একত্র হবে এবং প্রতিটি মানুষ আবার হুবহু সে মানুষটি হয়ে জীবনলাভ করবে, যে মানুষটি দশ-বিশ হাজার কোন এক সময় ছিল, এটা কি করে সম্ভব? মক্কার লোকদের এসব কথার জবাব আল্লাহ তা'আলা একটি ছোট প্রশ্নের আকারে অত্যন্ত যুক্তিগ্রাহ্য ও বলিষ্ঠভাবে দিয়েছেন। তিনি বলছেনঃ "মানুষ কি মনে করেছে যে, আমি তার হাড়গোড় আদৌ একত্রিত করতে পারবো ন"? অর্থাৎ যদি তোমাদেরকে বলা হতো, তোমাদের দেহের বিক্ষিপ্ত এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কোন এক সময় আপনা থেকেই একত্রিত হয়ে যাবে এবং তোমরাও আপনি থেকেই হুবুহু এই দেহ নিয়েই জীবিত হয়ে যাবে তাহলে এরূপ হওয়াটিকে অসম্ভব মনে করা তোমাদের নিঃসন্দেহে যুক্তিসঙ্গত হতো। কিন্তু তোমাদের তো বলা হয়েছে এ কাজটি আপনা থেকেই হবে না। বরং তা করবেন আল্লাহ তা'আলা নিজে। তাহলে কি তোমরা প্রকৃতপক্ষেই মনে করো যে, সারা বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টিকর্তা-যাকে তোমরা নিজেরাও সৃষ্টিকর্তা বলে স্বীকার করে থাকো-এ কাজ করতে অক্ষম? এটা এমন একটি প্রশ্ন যে, যারা আল্লাহ তা'আলাকে বিশ্ব-জাহানের স্রষ্টা বলে স্বীকার করে, সে যুগেও তারা বলতে পারতো না এবং বর্তমান যুগেও বলতে পারে না। যে, আল্লাহ তা'আলা নিজেও এ কাজ করতে চাইলে করতে পারবেন না। আর কোন নির্বোধ যদি এমন কথা বলেও ফেলে তাহলে তাকে জিজ্ঞেস করা যেতে পারে যে, তুমি আজ যে দেহের অধিকারী তার অসংখ্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বাতাস, পানি, মাটি এবং অজ্ঞাত আরো কত জায়গা থেকে এনে একত্রিত করে সে আল্লাহ এ দেহটি কিভাবে তৈরী করলেন যার সম্পর্কে তুমি বলছো যে, তিনি পুনরায় এসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ একত্রিত করতে সক্ষম নন? [তাফহীমুল কুরআন]

بَلَى قَادِرِينَ عَلَى أَنْ نُسَوِّيَ بَنَانَهُ

৪. অবশ্যই হ্যাঁ, আমরা তার আঙ্গুলের আগা পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম

অর্থাৎ বড় বড় হাড়গুলো একত্রিত করে পুনরায় তোমার দেহের কাঠামো প্রস্তুত করা এমন কিছুই নয়। আমি তো তোমার দেহের সূক্ষ্মতম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি তোমার আঙ্গুলের জোড়গুলোও পুনরায় ঠিক তেমন করে বানাতে সক্ষম। যেমন তা এর আগে ছিল, তবে তোমাদের পুনরুত্থিত করতে অসক্ষম হওয়ার কোন কারণ নেই।

بَلْ يُرِيدُ الْإِنْسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ

৫. বরং মানুষ তার ভবিষ্যতেও পাপাচার করতে চায়।

এ ছোট বাক্যটিতে আখেরাত অবিশ্বাসকারীদের আসল রোগ কি তা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে দেয়া হয়েছে। যেসব জিনিস এসব লোককে আখেরাত অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করতো তা মূলত এ নয় যে, প্রকৃতই তারা কিয়ামত ও আখেরাতকে অসম্ভব মনে করতো। বরং তারা যে কিয়ামত ও আখেরাতকে অস্বীকার করে তার মূল কারণ হলো, আখেরাতকে মেনে নিলে তাদের ওপর অনিবার্যভাবে কিছু নৈতিক বাধ্যবাধকতা আরোপিত হয়। সে বাধ্যবাধকতা মেনে নেয়া তাদের কাছে মোটেই মনঃপূত নয়। তারা চায় আজ পর্যন্ত তারা পৃথিবীতে যেরূপ লাগামহীন জীবন যাপন করে এসেছে ভবিষ্যতেও ঠিক তেমনি করতে পারে। আজ পর্যন্ত তারা যে ধরনের জুলুম-আত্যাচার, বেঈমানী, পাপাচার ও দুষ্কর্ম করে এসেছে ভবিষ্যতেও তা করার অবাধ স্বাধীনতা যেন তাদের থাকে। একদিন

তাদেরকে আল্লাহর বিচারালয়ে দাঁড়িয়ে এসব কাজের জবাবদিহি করতে হবে এ বিশ্বাস যেন তাদের অবৈধ লাগামহীন স্বাধীনতা ও স্বেচ্ছাচারিতার পথ রোধ করতে না পারে। তাই প্রকৃতপক্ষে তাদের বিবেক-বুদ্ধি তাদেরকে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনতে বাধা দিচ্ছে না। বরং তাদের প্রবৃত্তির কামনা বাসনাই এ পথের প্রতিবন্ধক।

يَسْأَلُ أَيَّانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

৬. সে প্রশ্ন করে, কখন কিয়ামতের দিন আসবে?

তারা এ প্রশ্ন এই জন্য করে না যে, কৃতপাপ হতে তওবা করবে। বরং কিয়ামত সংঘটিত হওয়াকে তারা অসম্ভব মনে করে। আর এই কারণেই তারা অন্যায়-অনাচার থেকে ফিরে আসে না। পরের আয়াতে মহান আল্লাহ কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় বর্ণনা করছেন।

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ

৭. যখন চোখ স্থির হয়ে যাবে

برقএর আভিধানিক অর্থ হলো বিদ্যুতের ঝলকে চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়া। কিন্তু প্রচলিত আরবী বাকরীতিতে কথাটি শুধু এ একটি অর্থ জ্ঞাপকই নয় বরং ভীতি-বিহবলতা, বিস্ময় অথবা কোন দুর্ঘটনার আকস্মিকতায় যদি কেউ হতবুদ্ধি হয়ে যায় এবং সে ভীতিকর দৃশ্যের প্রতি তার চক্ষু স্থির-নিবদ্ধ হয়ে যায় যা সে দেখতে পাচ্ছে তাহলে এ অবস্থা বুঝাতেও একথাটি বলা হয়ে থাকে। [ইবনে কাসীর] একথাটিই কুরআন মাজীদের আরেক জায়গায় এভাবে বলা হয়েছে, "আল্লাহ্ তো তাদের অবকাশ দিচ্ছেন সেদিন পর্যন্ত যেদিন চক্ষুসমূহ স্থির হয়ে যাবে।"

وَخَسَفَ الْقَمَرُ

৮. এবং চাঁদ হয়ে পড়বে কিরণহীন

وَ جُمِعَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ

৯. আর যখন সূর্য ও চাঁদকে একত্র করা হবে

এখানে কেয়ামতের পরিস্থিতি বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যখন চক্ষুতে ধাঁধা লেগে গেল— কেয়ামতের দিন সবার দৃষ্টিতে ধাঁধা লেগে যাবে। ফলে চক্ষু স্থির কোন বস্তু দেখতে পারবে না এবং চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে। [ইবন কাসীর] তাছাড়া আরেকটি অনুবাদ হচ্ছে, চন্দ্র গায়েব হয়ে যাবে, চন্দ্র বলতে কিছু আর থাকবে না। [কুরতুবী] চাঁদের আলোহীন হয়ে যাওয়া এবং চাঁদ ও সূর্যের পরস্পর একাকার হয়ে যাওয়ার অর্থ, মুজাহিদ বলেন, দু'টিকে একত্রে পেচানো হবে। [আত-তাফসীরুস সহীহ]

يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُّ

১০. সে-দিন মানুষ বলবে, আজ পালাবার স্থান কোথায়?

كَلَّا لَا وَزَرَ

১১. কখনোই নয়, কোন আশ্রয়স্থল নেই।

إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ

১২. সেদিন ঠাঁই হবে আপনার রবেরই কাছে।

يُنَبَّأُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ

১৩. সেদিন মানুষকে অবহিত করা হবে সে কী আগে পাঠিয়েছে ও কী পিছনে রেখে গেছে।

মূল বাক্যটি হলো (بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ) অর্থাৎ মানুষকে সেদিন অবহিত করা হবে যা সে অগ্রে প্রেরণ করেছে ও পশ্চাতে ছেড়ে এসেছে। এটা একটা ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক বাক্য। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে এবং সম্ভবত সবগুলোই এখানে প্রযোজ্য। এর একটি অর্থ হলো, দুনিয়ার জীবনে মানুষ মৃত্যুর পূর্বে কি কি নেক কাজ বা বাদ কাজ করে আখেরাতের জন্য আগ্রিম পাঠিয়ে দিয়েছিল সেদিন তাকে তা জানিয়ে দেয়া হবে। আর দুনিয়াতে সে নিজের ভাল এবং মন্দ কাজের কি ধরনের প্রভাব সৃষ্টি করে এসেছিল যা তার দুনিয়া ছেড়ে চলে আসার পরও পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত চলেছিল সে হিসেবও তার সামনে পেশ করা হবে। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহুম বলেন, মানুষ মৃত্যুর পূর্বে যে সৎকাজ করে নেয়, তা সে অগ্রে প্রেরণ করে এবং যে সৎ অথবা অসৎ উপকারী অথবা অপকারী কাজ ও প্রথা এমন ছেড়ে যায়, যা তার মৃত্যুর পর মানুষ বাস্তবায়িত করে, তা সে পশ্চাতে রেখে আসে। (এর সওয়াব অথবা শাস্তি সে পেতে থাকবে।) [দেখুন: বাগাভী; কুরতুবী]

দ্বিতীয় অর্থ হলো, যেসব কাজ সে আগে করেছে এবং যেসব কাজ সে পরে করেছে দিন তারিখ সহ তার পুরো হিসেব তার সামনে পেশ করা হবে। কাতাদা রাহেমাহুল্লাহ বলেন, قَدَّمَ বলে এমন সৎকাজ বোঝানো হয়েছে, যা মানুষ জীবদ্দশায় করে নেয় এবং أَخَّرَ বলে এমন সৎকাজ বোঝানো হয়েছে, যা সে করতে পারত, কিন্তু করেনি এবং সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছে। [কুরতুবী]

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ

১৪. বরং মানুষ নিজের সম্পর্কে সম্যক অবগত

আয়াতে بَصِيرَةٌশব্দটির অর্থ যদি ‘চক্ষুষ্মান’ ধরা হয়, তখন আয়াতের অর্থ এই যে, যদিও ন্যায়বিচারের বিধি অনুযায়ী মানুষকে তার প্রত্যেকটি কর্ম সম্পর্কে হাশরের মাঠে অবহিত করা হবে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর প্রয়োজন নেই। কেননা, মানুষ তার কর্ম সম্পর্কে খুব জ্ঞাত। সে কি করেছে, তা সে নিজেই জানে। তাই আখেরাতের আদালতে হাজির করার সময় প্রত্যেক কাফের, মুনাফিক, পাপী ও অপরাধী নিজেই বুঝতে পারবে যে, সে কি কাজ করে এসেছে এবং কোন অবস্থায় নিজ প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে; সে যতই অস্বীকার করুক বা ওযর পেশ করুক। [ইবন কাসীর] এছাড়া হাশরের মাঠে প্রত্যেকে তার সৎ কর্ম স্বচক্ষে দেখতেও পাবে। অন্য আয়াতে আছে, (وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا) অর্থাৎ “দুনিয়াতে মানুষ যা করেছে, হাশরের মাঠে তাকে উপস্থিত পাবে” [সূরা আল-কাহাফ: ৪৯] সুতরাং তারা তা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করবে। এখানে মানুষকে নিজের সম্পর্কে চক্ষুষ্মান বলার অর্থ তাই।

পক্ষান্তরে যদি بَصِيرَةٌশব্দের অর্থ ‘প্রমাণ’ হয় তখন আয়াতের অর্থ হবে এই যে, মানুষ নিজেই নিজের সম্পর্কে প্রমাণস্বরূপ হবে। সে অস্বীকার করলেও তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ স্বীকার করবে। [কুরতুবী]

وَّ لَوۡ اَلۡقٰی مَعَاذِیۡرَہٗ

১৫. যদিও সে নানা অজুহাতের অবতারণা করে।

মানুষের সামনে তারা আমলনামা পেশ করার উদ্দেশ্য আসলে অপরাধীকে তার অপরাধ সম্পর্কে অবহিত করা নয়। বরং এরূপ করা জরুরী এই কারণে যে, প্রকাশ্য আদালতে অপরাধের প্রমাণ পেশ করা ছাড়া ইনসাফের দাবী পূরণ হয় না। প্রত্যেক মানুষই জানে, সে নিজে কি? সে কি, একথা তাকে অন্য কারো বলে দিতে হয় না। একজন মিথ্যাবাদী গোটা দুনিয়াকে ধোঁকা দিতে পারে। কিন্তু সে নিজে একথা জানে যে, সে যা বলছে ত মিথ্যা। একজন চোর তার চৌর্যবৃত্তিকে ঢাকার জন্য অসংখ্য কৌশল অবলম্বন করতে পারে। কিন্তু সে যে চোর তা তার নিজের কাছে গোপন থাকে না। একজন পথভ্রষ্ট লোক হাজারো প্রমাণ পেশ করে মানুষকে একথা বিশ্বাস করাতে পারে যে, সে যে কুফরী, নাস্তিকতা ও শিরকের সামর্থ্যক তা তার মনের বিশ্বাসভিত্তিক সিদ্ধান্ত। কিন্তু তার নিজের বিবেক একথা ভাল করেই জানে যে, সে ঐসব আকীদা-বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে আছে কেন এবং মধ্যকার ভুল বুঝতে ও মেনে নিতে কিসে তাকে বাধা দিচ্ছে? জালেম, অসচ্চরিত্র, দুষ্কর্মশীল এবং হারামখোর মানুষ নিজের অপকর্মের পক্ষে নানা রকম ওজর-আপত্তি ও কৌশল পেশ করে নিজের বিবেকের মুখ পর্যন্ত বন্ধ করার চেষ্টা চালাতে পারে যাতে বিবেক তাকে তিরষ্কার করা থেকে বিরত থাকে এবং স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, সত্যিকারভাবেই কিছু বাধ্যবাধকতা, কিছু বৃহত্তর কল্যাণ এবং কিছু অনিবার্য প্রয়োজনে সে এসব করছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বাবস্থায় তার এটা জানা থাকে যে, সে কার প্রতি কতটা জুলুম করেছে, কার হক মেরে খেয়েছে, কার সতীত্ব নষ্ট করেছে, কাকে প্রতারণা করেছে এবং কোন অবৈধ পন্থায় কি কি স্বার্থ উদ্ধার করেছে। তাই আখেরাতের আদালতে হাজির করার সময় প্রত্যেক কাফের, মুনাফিক, পাপী ও অপরাধী নিজেই বুঝতে পারবে যে, সে কি কাজ করে এসেছে এবং কোন অবস্থায় নিজ প্রভুর সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

لَا تُحَرِّكۡ بِهٖ لِسَانَكَ لِتَعۡجَلَ بِهٖ

১৬. তাড়াতাড়ি ওহী আয়ত্ত করার জন্য আপনি তা নিয়ে আপনার জিহ্বাকে দ্রুত সঞ্চালন করবেন না।

اِنَّ عَلَيۡنَا جَمۡعَهٗ وَ قُرۡاٰنَهٗ

১৭. নিশ্চয় এর সংরক্ষণ ও পাঠ করাবার দায়িত্ব আমাদেরই।

فَاِذَا قَرَاۡنٰهُ فَاتَّبِعۡ قُرۡاٰنَهٗ

১৮. কাজেই যখন আমরা তা পাঠ করি আপনি সে পাঠের অনুসরণ করুন,

ثُمَّ اِنَّ عَلَيۡنَا بَيَانَهٗ

১৯. তারপর তার বর্ণনার দায়িত্ব নিশ্চিতভাবে আমাদেরই।

এ আয়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যা ওহী নাযিল হওয়ার সময় অবতীর্ণ আয়াতগুলো সম্পর্কিত। নির্দেশ এই যে, যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম কুরআনের কিছু আয়াত নিয়ে আগমন করতেন, তখন তা পাঠ করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দ্বিবিধ চিন্তায় জড়িত হয়ে পড়তেন যেন কোথায়ও এর শ্রবণ ও তদনুযায়ী পাঠে কোন পার্থক্য না হয়ে যায় বা কোথাও এর কোন অংশ, কোন বাক্য স্মৃতি থেকে উধাও না হয়ে যায়। এই চিন্তার কারণে যখন জিবরীল আলাইহিস সালাম কোন আয়াত শোনাতেন, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে সাথে পাঠ করতেন এবং জিহবা নেড়ে দ্রুত আবৃত্তি করতেন, যাতে বার বার পড়ে তা মুখস্থ করে নেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর এই পরিশ্রম ও কষ্ট দূর করার উদ্দেশ্যে এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা কুরআন পাঠ করানো,

মুখস্থ করানো ও মুসলিমদের কাছে হুবহু পেশ করানোর দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলে দিয়েছেন যে, আপনি এই উদ্দেশ্যে জিহবাকে দ্রুত নাড়া দেয়ার কষ্ট করবেন না।

আয়াতসমুহকে আপনার অন্তরে সংরক্ষণ করা এবং হুবহু আপনার দ্বারা পাঠ করিয়ে দেয়া আমার দায়িত্ব। কাজেই আপনি এ চিন্তা পরিত্যাগ করুন। সুতরাং যখন আমি অর্থাৎ আমার পক্ষ থেকে জিবরীল আলাইহিস সালাম কুরআন পাঠ করে, তখন আপনি সাথে সাথে পাঠ করবেন না; বরং চুপ করে শুনবেন এবং আমার পাঠের পর পাঠ করবেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই করতেন। তিনি জিবরীল থেকে শুনতেন তারপর জিবরীল চলে গেলে তা অনুরূপ পড়তেন যেমন জিবরীল পড়েছেন। [বুখারী: ৫, মুসলিম, ৪৪৮] এখানে কুরআন অনুসরণ করান মানে চুপ করে জিবরীলের পাঠ শ্রবণ করা। অবশেষে বলা হয়েছে আপনি এ চিন্তাও করবেন না যে, অবতীর্ণ আয়াতসমূহের সঠিক মর্ম ও উদ্দেশ্য কি? এটা বুঝিয়ে দেয়াও আমার দায়িত্ব। আমি কুরআনের প্রতিটি শব্দ ও তার উদ্দেশ্য আপনার কাছে ফুটিয়ে তুলব। [ইবনে কাসীর]

كَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ

২০. কখনো না, বরং তোমরা দুনিয়ার জীবনকে ভালবাস;

মাঝখানে চার আয়াতে রসুলুল্লাহ (সা)-কে একটি বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যা ওহী নাযিল হওয়ার সময় অবতীর্ণ আয়াতগুলো সম্পর্কিত। সূরার শুরু থেকে বক্তব্যের যে ধারাবাহিকতা ছিল এখানে এসে আবার সে ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে। কখখনো না, অর্থ হলো, তোমাদের আখেরাতকে অস্বীকার করার আসল কারণ এটা নয় যে, বিশ্ব-জাহানের সৃষ্টিকর্তা কিয়ামত সংঘটিত করতে কিংবা মৃত্যুর পর তোমাদেরকে আবার জীবিত করতে পারবেন না বলে তোমরা মনে করো বরং আসল কারণ হলো এটি।

وَ تَذَرُوْنَ الْاٰخِرَةَ

২১. আর তোমরা আখেরাতকে উপেক্ষা কর।

এটি আখেরাতকে অস্বীকার করার দ্বিতীয় কারণ। প্রথম কারণটি ৫ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছিল। কারণটি হলো, মানুষ যেহেতু অবাধে পাপাচার চালাতে চায় এবং আখেরাতকে মেনে নিলে অনিবার্যরূপে যেসব নৈতিক বিধিবন্ধন মেনে চলার দায়িত্ব বর্তায় তা থেকে বাঁচতে চায়। তাই তার কুপ্রবৃত্তি তাকে আখেরাতকে অস্বীকার করতে উদ্বুদ্ধ করে এবং তার এ অস্বীকৃতিকে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রমাণ করার জন্য সে সুন্দর করে সাজিয়ে যৌক্তিক প্রমাণাদি পেশ করে। এখন দ্বিতীয়, কারণটি বর্ণনা করা হচ্ছে। আখেরাত অস্বীকারকারীরা যেহেতু সংকীর্নমনা ও স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন হয় তাই তাদের দৃষ্টি কেবল এ দুনিয়ার ফলাফলের প্রতি নিবদ্ধ থাকে। আর আখেরাতে যে ফলাফলের প্রকাশ ঘটবে তাকে তারা আদৌ কোন গুরুত্ব দেয় না। তারা মনে করে, যে স্বার্থ বা ভোগের উপকরণ বা আনন্দ এখানে লাভ করা সম্ভব তারই অন্বেষণে সবটুকু পরিশ্রম করা এবং প্রচেষ্টা চালানো উচিত। কারণ, তা যদি তারা লাভ করে তাহলে যেন সবকিছুই তারা পেয়ে গেল। এতে আখেরাতে তাদের পরিণাম যত খারাপই হোক না কেন। একইভাবে তারা এ ধারণাও পোষণ করে যে, যে ক্ষতি, কষ্ট বা দুঃখ-বেদনা এখানে হবে তা থেকে মূলত নিজেদের রক্ষা করতে হবে। এক্ষেত্রে দেখার দরকার নেই যে, তা বরদাশত করে নিলে আখেরাতে তার বিনিময়ে কত বড় পুরস্কার লাভ করা যাবে। তারা চায় নগদ সওদা। আখেরাতের মত বহু দূরের জিনিসের জন্য তারা আজকের কোন স্বার্থ যেমন ছাড়তে চায় না তেমনি কোন ক্ষতিও বরদাশত করতে পারে না। এ

ধরনের চিন্তাধারা নিয়ে যখন তারা আখেরাত সম্পর্কে যৌক্তিক বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তখন আর তা খাঁটি যুক্তিবাদ থাকে না। বরং তখন তার পেছনে এ ধ্যান-ধারণাটিই কাজ করতে থাকে। আর সে কারণে সর্বাবস্থায় তার সিদ্ধান্ত এটাই থাকে যে, আখেরাতকে মানা যাবে না। যদিও ভেতর থেকে বিবেক চিৎকার করে বলতে থাকে যে, আখেরাত সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা এবং তার অনিবার্যতা সম্পর্কে কুরআন যেসব দলীল-প্রমাণ পেশ করা হয়েছে তা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত আর তার বিপক্ষে যেসব যুক্তি তারা দেখাচ্ছে তা অত্যন্ত ভোঁতা ও অন্তসারশূন্য।

وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ

২২. সেদিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে,

খুশীতে তারা দীপ্তিময় হয়ে উঠবে। কারণ, তারা যে আখেরাতের প্রতি ঈমান এনেছিল তা হুবহু তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী চোখের সামনে বিদ্যমান থাকবে। যে আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার কারণে তারা দুনিয়ার যাবতীয় অবৈধ স্বার্থ পরিত্যাগ করেছিল এবং সত্যিকার অর্থেই ক্ষতি স্বীকার করেছিল তা চোখের সামনে বাস্তবে সংঘটিত হতে দেখে নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, তারা নিজেদের জীবনাচরণ সম্পর্কে অত্যন্ত সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এখন তার সর্বোত্তম ফলাফল দেখার সময় এসে গেছে।

اِلٰى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

২৩. তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

সেদিন কিছু মুখমন্ডল হাসি-খুশী ও সজীব হবে এবং তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, আখেরাতে জান্নাতীগণ স্বচক্ষে আল্লাহ তা'আলার দীদার (দর্শন) লাভ করবে। আহলে সুন্নাত-ওয়াল-জামা'আতের সকল আলেম ও ফেকাহবিদ এ বিষয়ে একমত। বহু সংখ্যক হাদীসে এর যে ব্যাখ্যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত হয়েছে তাহলো, আখেরাতে আল্লাহর নেককার বান্দাদের আল্লাহর সাক্ষাত লাভের সৌভাগ্য হবে। এক হাদীসে এসেছে, "তোমরা প্রকাশ্যে সুস্পষ্টভাবে তোমাদের রবকে দেখতে পাবে" [বুখারী: ৭৪৩৫, ৫৫৪, ৪৭৩, ৪৮৫১, ৭৪৩৪, ৭৪৩৬]

অন্য হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বেহশতবাসীরা বেহেশতে প্রবেশ করার পর আল্লাহ তা'আলা তাদের জিজ্ঞেস করবেন, তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের আরো কিছু দান করি? তারা আরয করবে, আপনি কি আমাদের চেহারা দীপ্তিময় করেননি? আপনি কি আমাদের জান্নাতে প্রবেশ করাননি এবং জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেননি? তখন আল্লাহ তা'আলা পর্দা সরিয়ে দেবেন। ইতিপুর্বে তারা যেসব পুরস্কার লাভ করেছে তার কোনটিই তাদের কাছে তাদের রবের সাক্ষাতলাভের সম্মান ও সৌভাগ্য থেকে অধিক প্রিয় হবে না। এটিই হচ্ছে সে অতিরিক্ত পুরস্কার যার কথা কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে, অর্থাৎ "যারা নেক কাজ করেছে তাদের জন্য উত্তম পুরস্কার রয়েছে। আর এ ছাড়া অতিরিক্ত পুরস্কারও রয়েছে।" [সূরা ইউনুস: ২৬] [মুসলিম: ১৮১, তিরমিযী: ২৫৫২, মুসনাদে আহমাদ: ৪/৩৩৩]

অন্য হাদীসে এসেছে, সাহাবায়ে কিরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল, আমরা কি কিয়ামতের দিন আমাদের রবকে দেখতে পাবো? জবাবে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন মেঘের আড়াল থাকে না তখন সূর্য ও চাঁদকে দেখতে তোমাদের কি কোন কষ্ট হয়? সবাই বলল, না। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের রবকে এরকমই স্পষ্ট দেখতে পাবে। [বুখারী: ৭৪৩৭, মুসলিম: ১৮২] এ সমস্ত হাদীস এবং অন্য আরো বহু

হাদীসের ভিত্তিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অনুসারীগণ প্রায় সর্বসম্মতভাবেই এ আয়াতের যে অর্থ করেন তাহলো, জান্নাতবাসীগণ আখেরাতে মহান আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভে ধন্য হবে। কুরআন মজীদের এ আয়াত থেকেও তার সমর্থন পাওয়া যায়। "কক্ষনো নয়, তারা (অর্থাৎ পাপীগণ)" সেদিন তাদের রবের সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত হবে। [সূরা আল-মুতাফফিফীন: ১৫] এ থেকে স্বতই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এ বঞ্চনা হবে পাপীদের জন্য নেককারদের জন্য নয়। [ইবনে কাসীর]

وَ وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍۢ بَاسِرَةٌ

২৪. আর কোন কোন মুখমণ্ডল হয়ে পড়বে বিবর্ণ,

تَظُنُّ اَنْ يُّفْعَلَ بِهَا فَاقِرَةٌ

২৫. আশংকা করবে যে, এক ধ্বংসকারী বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে।

كَلَّاۤ اِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ

২৬. অবশ্যই, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হবে,

وَ قِيْلَ مَنْ ۬ۜ رَاقٍ

২৭. এবং বলা হবে, কে তাকে রক্ষা করবে?

মূল আয়াতে راق শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এটি رقية ধাতু থেকেও উৎপন্ন হতে পারে। এর অর্থ তাবীজ-কবচ এবং ঝাড়-ফুঁক। আবার رقي ধাতু থেকেও উৎপন্ন হতে পারে। এর অর্থ ওপর দিকে ওঠা। যদি প্রথম অর্থটি গ্রহণ করা হয় তাহলে যা বুঝাবে তাহলো, শেষ মুহূর্তে যে সময় রোগীর সেবা শুশ্রূসাকারীরা সব রকমের ওষুধ পত্র সম্পর্কে নিরাশ হয়ে যাবে তখন বলবেঃ আরে, কোন ঝাড় ফূঁককারীকেই অন্তত খুঁজে আনো যে এর জীবনটা রক্ষা করবে। আর যদি দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হয় তাহলে যা বুঝাবে তা হলো, সে সময় ফেরেশতারা বলবেঃ কে এ রূহটা নিয়ে যাবে? আযাবের ফেরেশতারা না রহমতের ফেরেশতারা? অন্য কথায় সে সময় সিদ্ধান্ত হয়ে যাবে, ঐ ব্যক্তি আখেরাতের দিকে কি মর্যাদা নিয়ে যাত্রা করেছে। সৎ মানুষ হলে রহমতের ফেরেশতারা নিয়ে যাবে। অসৎ মানুষ হলে রহমতের ফেরেশতারা তার ছায়াও মাড়বে না। আযাবের ফেরেশতারাই তাকে পাকড়াও করে নিয়ে যাবে।

وَّ ظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقُ

২৮. তখন তার প্রত্যয় হবে যে, এটা বিদায়ক্ষণ।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কিয়ামতের হিসাব-নিকাশ এবং জান্নাতী ও জাহান্নামীদের কিছু অবস্থা বর্ণনা করার পর এই আয়াতে মৃত্যুর প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে, যাতে সে মৃত্যুর পূর্বেই পরকালে মুক্তি পাওয়ার জন্য ঈমান ও সৎ কর্মের দিকে ধাবিত হয়। আয়াতে মৃত্যুর চিত্র অংকন প্রসঙ্গে বলা হয়েছে গাফিল মানুষ যখন বিস্মৃতির অতলে তলিয়ে থাকে, তখন তার মাথার উপর মৃত্যু এসে দণ্ডায়মান হয় এবং আত্মা কণ্ঠনালীতে এসে ঠেকে। শুশ্রূষাকারীরা চিকিৎসায় ব্যর্থ হয়ে ঝাড়ফুককারীদেরকে খুঁজতে থাকে এবং পায়ের গোছা অন্য গোছার সাথে জড়িয়ে যায়। এটাই আল্লাহর কাছে যাওয়ার সময়। এ সময়ে কোন তওবা কবুল হয় না এবং কোন আমলও করা যায় না। কাজেই বুদ্ধিমানের উচিত এর আগেই সংশোধনের চেষ্টা করা।

وَ الْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ

২৯. আর পায়ের গোছার সঙ্গে পায়ের গোছা জড়িয়ে যাবে।

ساق এর প্রসিদ্ধ অর্থ পায়ের গোছা। গোছার সাথে জড়িয়ে পড়ার এক অর্থ এই যে, তখন অস্থিরতার কারণে এক গোছা দ্বারা অন্য গোছার উপর আঘাত করবে। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, দুর্বলতার আতিশয্যে এক পা অপর পায়ের উপর থাকলে তা সরাতে চাইলেও সক্ষম হবে না। ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু বলেন, তখন হবে দুনিয়ার শেষ দিন এবং আখেরাতের প্রথম দিনের সম্মিলন। তাই মানুষ দুনিয়ার শেষ দিন এবং আখেরাতের বিরহ-বেদনা এবং আখেরাতে কি হবে না হবে তার চিন্তায় পেরেশান থাকবে। অর্থাৎ সে সময় দুটি বিপদ একসাথে এসে হাজির হবে। একটি এ পৃথিবী এবং এর সবকিছু থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার বিপদ।। আরেকটি, একজন অপরাধী হিসেবে গ্রেফতার হয়ে আখেরাতের জীবনে যাওয়ার বিপদ যার মুখোমুখি হতে হবে প্রত্যেক কাফের মুনাফিক এবং পাপীকে। [ইবনে কাসীর]

اِلٰى رَبِّكَ يَوْمَئِذِ الْمَسَاقُ

৩০. সেদিন আপনার রবের কাছেই সকলকে হাঁকিয়ে নেয়া হবে।

فَلَا صَدَّقَ وَ لَا صَلّٰى

৩১. সুতরাং সে বিশ্বাস করে নি এবং সালাতও আদায় করে নি।

وَ لٰكِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى

৩২. বরং সে মিথ্যারোপ করেছিল এবং মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল।

ثُمَّ ذَهَبَ اِلٰى اَهْلِهٖ يَتَمَطّٰى

৩৩. তারপর সে তার পরিবার পরিজনের কাছে চলে গিয়েছিল অহংকার করে,

যে ব্যক্তি আখেরাতকে মানতে প্রস্তুত ছিল না সে পূর্ব বর্ণিত আয়াতগুলোতে উল্লেখিত সবকিছু শোনার পরেও তা অস্বীকার করে যেতে থাকলো এবং এসব আয়াত শোনার পর দর্পভরে নিজের বাড়ীর দিকে চলে গেল। মুজাহিদ, কাতাদ ও ইবনে যায়েদের মতে এ লোকটি ছিল আবু জেহেল। আয়াতের শব্দসমূহ থেকেও এটাই প্রকাশ পায় যে, সে এমনকোন ব্যক্তি ছিল যে সূরা কিয়ামার ওপরে বর্ণিত আয়াতগুলো শোনার পর এ আচরণ ও কর্মপন্থা গ্রহণ করেছিল।

আয়াতের “সে সত্যকে অনুরসণ করেনি, নামাযও পড়েনি" কথাটি বিশেষভাবে মনযোগলাভের যোগ্য। এর থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে আল্লাহ এবং তাঁর রসূল ও তাঁর কিতাবের সত্যতা স্বীকার করার পর তার প্রাথমিক এবং অনিবার্য দাবী হলো, মানুষ যেন নামায পড়ে। আল্লাহর দেয়া শরীয়াতের অন্য সব হুকুম-আহকাম তামীল করার পর্যায় বা অবকাশ তো আসে আরো পরে। কিন্তু ঈমান আনার পর কিছু সময় যেতে না যেতেই নামাযের সময়

এসে হাজির হয়। আর তখনই জানা যায় সে যা মেনে নেয়ার অঙ্গীকার মুখ থেকে উচ্চারণ করেছিল তা সত্যিই তার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি, না কি কয়েকটি শব্দের আকারে মুখ থেকে উচ্চারিত ফাঁকা বুলি মাত্র।

اَوۡلٰى لَكَ فَاَوۡلٰى

৩৪. দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ!

ثُمَّ اَوۡلٰى لَكَ فَاَوۡلٰى

৩৫. আবার দুর্ভোগ তোমার জন্য, দুর্ভোগ!

أَوْلَىٰ অর্থ ধ্বংস, দুর্ভোগ। সর্বনাশ হোক তোমার! মন্দ, ধ্বংস এবং দুর্ভাগ্য হোক তোমার! এখানে কাফিরদেরকে খুবই মারাত্মকভাবে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। [ফাতহুল কাদীর] ইবন কাসীর বলেনঃ এটি একটি শ্লেষ বাক্যও হতে পারে। কুরআন মজীদের আরো এক জায়গায় এ ধরনের বাক্য প্রয়োগ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যে, জাহান্নামে আযাব দেয়ার সময় পাপী লোকদের বলা হবেঃ "নাও, এর মজা আস্বাধন করে নাও। তুমি অতি বড় সম্মানী মানুষ কিনা।" [সূরা আদ-দুখান: ৪৯]

اَيَحۡسَبُ الۡاِنۡسَانُ اَنۡ يُّتۡرَكَ سُدًى

৩৬. মানুষ কি মনে করে যে, তাকে এমনি ছেড়ে দেয়া হবে?

আয়াতের অর্থ হলো, মানুষ কি নিজেকে মনে করে যে তার স্রষ্টা তাকে এ পৃথিবীতে দায়িত্বহীন করে ছেড়ে দিয়েছেন? এ-কথাটিই কুরআন মজীদের অন্য একস্থানে এভাবে বলা হয়েছে যে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা কাফেরদের বলবেন, "তোমরা কি মনে করেছে যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি? তোমাদেরকে কখনো আমার কাছে ফিরে আসতে হবে না?" [সূরা আল মুমিনুন: ১১৫] এ দু'টি স্থানে মৃত্যুর পরের জীবনের অনিবার্যতার প্রমাণ প্রশ্নের আকারে পেশ করা হয়েছে। প্রশ্নের তাৎপর্য হলো আখেরাত যে অবশ্যই হবে তার প্রমাণ। [ইবনে কাসীর]

اَلَمۡ يَكُ نُطۡفَةً مِّنۡ مَّنِىٍّ يُّمۡنٰى

৩৭. সে কি বীর্যের স্খলিত শুক্রবিন্দু ছিল না?

ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوّٰى

৩৮. তারপর সে 'আলাকা'য় পরিণত হয়। অতঃপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেন এবং সুঠাম করেন।

فَجَعَلَ مِنۡهُ الزَّوۡجَيۡنِ الذَّكَرَ وَ الۡاُنۡثٰى

৩৯. অতঃপর তিনি তা থেকে সৃষ্টি করেন যুগল—নর ও নারী।

اَلَيۡسَ ذٰلِكَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنۡ يُّحۡىِۦَ الۡمَوۡتٰى

৪০. তবুও কি সে স্রষ্টা মৃতকে পুনর্জীবিত করতে সক্ষম নন?

এক বর্ণনায় এসেছে, সাহাবীগণের একজন তার ঘরের ছাদে সালাত আদায় করত; যখনই সূরা আল-কিয়ামাহ এর এ আয়াতে পৌছত তখনই সে বলত: سُبْحَانَكَ فَبَلَى (সুবহা-নাকা ফাবালা), অর্থাৎ তুমি পবিত্র, অবশ্যই (তুমি সক্ষম)। (আবূ দাঊদ ৮৮৩, ৮৮৪নং, বাইহাক্বী)

ফুটনোট

⊡ সূরার শুরুতে দুইটি বিষয়ের শপথ উল্লেখ করা হয়েছে- কিয়ামতের দিনব, এবং নাফসে লাওয়ামা।

⊡ মূলতঃ নফস তিনটি গুণে গুণান্বিত হয়। নফসে আম্মারা, লাওয়ামা ও মুতমায়িন্নাহ। নাফসে আম্মারা - সে মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত হতে জোরদার আদেশ করে। নফসে লাওয়ামা-মন্দ কাজ ও ত্রুটির কারণে অনুতপ্ত হতে শুরু করে। সৎকর্মে উন্নতি ও আল্লাহর নৈকট্যলাভে চেষ্টা করতে করতে যখন শরীয়তের আদেশ-নিষেধ প্রতিপালন তার মজ্জাগত ব্যাপার হয়ে যায় এবং শরীয়তবিরোধী কাজের প্রতি স্বভাবগত ঘৃণা অনুভব করতে থাকে, তখন এই নফসই মুতমায়িন্নাহ বা সন্তুষ্টচিত্ত উপাধি প্রাপ্ত হয়।

⊡ আখিরাত অস্বীকারকারীরা নানা যুক্তি দেয় যে, কিয়ামত কখন হবে বা মৃত্যুর পর আবার একত্রিত করা সম্ভব কি না? উত্তরে এখানে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে- শুধুমাত্র বড় বড় হাড়গুলো একত্রিত করে পুনরায় দেহের কাঠামো প্রস্তুত করতে পারবেন এমন কিছুই নয়। বরং আমাদের দেহের সূক্ষ্মতম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এমনকি আঙ্গুলের জোড়গুলোও, রেখাগুলোও পুনরায় ঠিক তেমন করে বানাতে তিনি সক্ষম।

⊡ নফসই মুতমায়িন্নাহ যাদের অর্জিত হয় তারা দ্বীনী ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ বা প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে মুক্ত হয়ে 'কালবে সালীম' বা সুস্থ হৃদয়ের অধিকারী হয়।

⊡ আখেরাত অবিশ্বাসকারীদের দু'টি রোগ বা কারণ উল্লেখ রয়েছে সূরাটিতে- এক. মানুষ তার পাপাচার ভবিষ্যতেও করতে চায় (আয়াত ৫) দুই. তোমরা দুনিয়ার জীবনকে ভালবাস আর আখেরাতকে উপেক্ষা করে (আয়াত ২০-২১)

⊡ কিয়ামতের দিনের কিছু পরিস্থিতি এই সূরায় উল্লেখ করা হয়েছে-

- যখন চোখ স্থির হয়ে যাবে- অর্থাৎ যখন চক্ষুতে ধাঁধা লেগে যাবে।
- চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে যাবে
- চাঁদ ও সূর্যের পরস্পর একাকার হয়ে যাবে
- মানুষের পালাবার কোন স্থান থাকবে না, থাকবে আশ্রয়স্থল

⊡ কিয়ামতের দিন ঈমানদারদের অবস্থা হবে-

- তাদের মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে
- তারা তাদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে।

⊡ সাহাবীগণের একজন তার ঘরের ছাদে সালাত আদায় করত; যখনই সূরা আল-কিয়ামাহ শেষ আয়াতে পৌছত তখনই সে বলত: سُبْحَانَكَ فَبَلَى (সুবহা-নাকা ফাবালা), অর্থাৎ তুমি পবিত্র, অবশ্যই (তুমি সক্ষম)।